সাম্যবাদী আন্দোলনে—ঐতিহাসিক ২৪শে এপ্রিল

ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর দল সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের অভ্যুত্থান

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক - সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ. ১৩শ সংখ্যা | শুক্রবার, ২০শে এপ্রিল ১৯৫১ ৭ই বৈশাখ ১৩৫৮ | মূল্য—দুই আনা

সাম্যবাদী দলের অপরিহার্য্যতা

ভারতবর্ষে সাম্যবাদী আন্দোলন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকেই সুরু হয়। এ পর্য্যন্ত কতকগুলি ছোট বড় সাম্যবাদী নামধারী দল নিজস্ব চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে সাম্যবাদী দল ও আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন; কিন্তু এ কথা আজ নিপীড়িত জনসাধারণ ও প্রত্যেক চিন্তাশীল বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রই ক্রমশঃ অনুধাবন করছেন যে, আমাদের দেশে এখনও সঠিক সাম্যবাদী দল গড়ে ওঠেনি। এই সমস্ত দলের নিজস্ব চিন্তা বা মতবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ ও কর্ম তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও কেন এই ব্যর্থতা? এর জবাব প্রত্যেক কর্তব্য পরায়ণ ব্যক্তিকেই নিজের কাছে ও জন সমক্ষে দিতে হচ্ছে। যাঁরাই এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে দলের প্রতি কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েছেন—সেই দলের কাছে যত খাঁটিই তারা হোন না কেন—সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁদের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রমিক-দলহীন বিপ্লব নায়কহীন নাটকের নামান্তর

সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর দল গড়ার জন্য যে সমস্ত মূল বিষয় গোড়া থেকে অনুসরণ করা অপরিহার্য্য তা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে আরম্ভ করে সোস্যালিষ্ট পার্টি, বিপ্লবী সাম্যবাদী—সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি সব দলই সে দিকে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে, হয় পুঁথিগত বিদ্যার আড়ালে নিজেদের মেকী চরিত্র ঢেকে চলেছেন নয়তো সাম্যবাদের বিজ্ঞানকে নানা অজুহাতে অস্বীকার করে খেয়াল খুশী মত টীকা দাঁড় করিয়েছেন এতে আত্ম তৃপ্তি থাকতে পারে কিন্তু জানতেই হোক বা অজ্ঞাতেই হোক সাম্যবাদী দল ও আন্দোলনে বিচ্যুতি, বিভ্রান্তি ও বিভেদ এইখানেই দানা বেঁধেছে—সর্বোপরি মূল উদ্দেশ্য সর্বহারা বিপ্লব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শ্রমিক দল কোন নীতিতে গড়ব

ঐতিহাসিক ২৪শে এপ্রিল এই সমস্ত বিচ্যুতি, বিভ্রান্তি ও বিভেদের [illegible] এক নূতন যুগের সূচনা করেছে। বিগত দিনের মধ্যবিও বিপ্লবী আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী অভিযানের ব্যর্থতা হতে, আমাদের দেশের তথা কথিত সাম্যবাদীদের টালবাহনা হতে, দক্ষিণ পন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতি ও বামপন্থী অতি উগ্র বিপ্লবীপনার বিরুদ্ধে; শতাব্দীর অন্ধকারময় মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস এবং বর্তমান ঘুনেধরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে—সাম্যবাদী আন্দোলনের অগ্রণী অংশ, সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পদ্ধতি—গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে ভারতের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর দল গড়ায় বদ্ধ পরিকর হন।

ভ্রান্ত নীতি—আদর্শচ্যুত করে

সমাজ বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে একটি মৌলিক সত্য এই যে, সর্বহারা বিপ্লব নেতৃত্বকারী শ্রমিক শ্রেণীর দল ছাড়া অসম্ভব—অথচ এই দল গড়ার কাজ এড়িয়ে, এক ভ্রান্তনীতি অন্য আর একটি ভ্রান্তনীতিতে চাপা দেওয়ার চেষ্টায় ব্যক্তি-ব্যস্ত দলগুলো, নিজেদের দলকে খাঁটি শ্রমিক শ্রেণীর দল বলে জাহির করতে উঠে পড়ে লেগেছেন—যার মর্মান্তিক পরিণতি দেখতে পাই গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যেকটি নূতন নূতন ভুল নীতি প্রকাশে। এই দল সাম্যবাদী শাসন কালে জাতীয় ধনিক শ্রেণীর সংস্কারবাদী বিরুদ্ধবাদী ভূমিকা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে একবার সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল আবার পরে পুরোপুরি বিপ্লবী ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। এ ছাড়া দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন নীতিতে ধনিক শ্রমিকের মূল বিরোধ শ্রেণী সংগ্রামকে সরাসরি অস্বীকার করে, শেষ পর্য্যন্ত অতি উগ্র বিপ্লবীপনার ধাক্কায় ভেসে চলে। শ্রমিক দলের মূল ভিত্তি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণে এর উপর যে এই দল দাঁড়িয়ে নেই, তা নিজেদের স্বীকৃতিতেই স্পষ্ট হয়ে রয়েছে—তবুও এঁরা খাঁটি সাম্যবাদী ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি! একেই জোড়াতালি দিতে দলের কর্মীদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিক শ্রেণীর দলের পথে—এস, ইউ, সি

শ্রমিক শ্রেণীর দল যে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে গড়ে উঠা অপরিহার্য্য—তার প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ না করে, কর্মীদের সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা নীতির উপর ভিত্তি না করে; সর্বক্ষণের জন্য কর্মীদের চিন্তা দ্বান্দিক পদ্ধতিতে গড়ে না তুলে, নেতৃত্বের বোঝা- [illegible] সাহায্য করলেও খাঁটি শ্রমিক দল গড়ে উঠবে না—বামপন্থা রুখতে গিয়ে দক্ষিণের

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

২৪শে এপ্রিল পালন করুন

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে ২৪শে এপ্রিল এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের জন্ম। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ভারতবর্ষের তথাকথিত বামপন্থী ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে ধনিকশ্রেণীর তাঁবেদারীতে ব্যস্ত তখন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমস্ত রকম বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি হতে রক্ষা করে। ইতিহাসের কোষ্টিপাথরে আজ তার চিন্তাধারার নির্ভুলতা পদে পদে প্রমাণিত হয়েছে। আদর্শগত ক্ষেত্রে আজ এস, ইউ, সির নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও এস, ইউ, সি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের বড় বড় দলগুলি যখন অন্তর্বিরোধ ও বিভ্রান্তিতে টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে তখন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার যে তার পূর্ব্ব শক্তি বজায় রেখেছে তাই নয় দ্রুত গতিতে সে শক্তি বাড়িয়েও চলেছে। এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। ভারতীয় শ্রমজীবি জনতা আজ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের মধ্যে তাদের মুক্তির নিশানা দেখতে পাচ্ছে, তাই তার এ অগ্রগতি।

কমরেডস্, দ্রুতগতিতে গোটা দুনিয়ার রাজনৈতিক পটক্ষেপ পরিবর্তিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীদের রক্তচোষার চক্রান্ত ব্যর্থ করে নতুন দিনের জন্ম দেবার কাজে সংঘবদ্ধ হচ্ছে শোষিত মানব। ইউরোপ দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া, আরও নানা দেশে তাদের সে সংঘ শক্তি মুক্তির দোর খোলে খোলে। ভারতবর্ষে সে জাগরণ কি দেখা দেবে না? অত্যাচারীর অত্যাচার, ক্ষমতার দম্ভ আর শোষণ কি এখানে ভাঙবে না? নতুন দিনের নতুন সূর্য্য কি আমাদের গণজীবনে জাগবে না? জাগবে—জাগবেই জাগবে। তবে তার জন্য প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দলের, [illegible] বেড়ে চলেছে; তাকে বিরাট রূপ দেবার কর্তব্য শ্রমজীবি ভারতবাসীর। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারকে শক্তিশালী করে সে ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করুন।

এস, ইউ, সি জিন্দাবাদ বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক

অনধিকারী উচ্ছেদ বিল ও বাস্তুহারা আন্দোলন

সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরে "অনধিকারী উচ্ছেদ বিল" (Eviction of persons in unauthorised occupation of land Bill 1951) নিয়ে পশ্চিবঙ্গের পরিষদের ভেতরে এবং বাইরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বহু বাক বিতণ্ডা বহু জল্পনা কল্পনা চলেছে এই বিলটির যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে। কিন্তু তবুও একে আটকান গেলোনা, কয়েকটি সংশোধন যোগ করে অবশেষে ভোটের জোরেই এটা পাশ হয়ে গেল। অনধিকারী দখলকারী বলা হয়েছে তাদেরই যে সমস্ত বাস্তুহারারা (বিলের সংজ্ঞা অনুযায়ী) দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে অন্যের জমিতে প্রবেশ ও দখল করে নিজেদের বাসস্থান নির্মান করেছে। প্রথমেই প্রশ্ন আসে পূর্ব্ববঙ্গ হতে এদের চলে আসবার জন্য দায়ী কে ? কোন কারনে এরা চলে আসতে বাধ্য হয় ? এদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব কার ? সে দায়িত্ব কতটুকু পালন করা হয়েছে ? এটা অনস্বীকার্য্য যে, যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ লোক নিজেদের ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছেন তার জন্য দায়ী তাঁরা নন। কারণ একথা কারও অবিদিত নয় যে কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবর্গের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই দেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে— জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ধাপ্পা দিয়ে। আর বাস্তুহারা সমস্যা যে এই দেশ বিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিনতি সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। দেশ বিভাগের সময় কংগ্রেসী ছোট বড় নেতারা সকলেই প্রাণভরা আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন এই সব সংখ্যালঘিষ্ঠদের লক্ষ্য করে। এদের স্বার্থকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন অনেকে। কিন্তু বাস্তবে যখন এরা ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হল তখন প্রমান হয়ে গেল এই সমস্ত আশ্বাস বাণীর অসারত্ব। এদের পুনর্ব্বাসনের দায়ীত্ব এড়িয়ে সরকারকে দেখা গেল সম্পূর্ণ উদাসীন। সরকারী অব্যবস্থার ফলে ষ্টেশনে, পথে, ঘাটে বা বিভিন্ন শিবিরে যে কি দুর্গতির ভেতর দিয়ে এদের দিন কেটেছে সেটা পশ্চিমবঙ্গবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। এইভাবে দিনের পর দিন যখন কেটে গেল, প্রকৃত স্থায়ী পুনর্ব্বাসনের যখন কোন ব্যবস্থাই হ'ল না তখন এরা সরকারী সাহায্য ছাড়াই [illegible] শ্রমে এবং স্বার্থে গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন ক্যাম্প ও কলোনী। স্বভাবতই তাদের বিভিন্ন জমিতে তথাকথিত অনধিকারী দখলকারী হতে হয়েছে। গোড়াতেই যদি সরকার এদের ব্যবস্থা করে দিত তবে এই অনধিকারী দখলের কোন প্রয়োজনই হ'ত না। শুধু তাই নহে— সে সময়ে এই সমস্ত জমি বেশীরভাগই ছিল পতিত জমি, বন জঙ্গলে ভর্তি।

সেই সমস্ত জমিকে বাসোপযোগী হিসেবে তৈরী করার কৃতিত্ব এদেরই। বাস্তুহারাদের প্রচেষ্টায় যখন এই ধরণের ক্যাম্প গঠিত হচ্ছিল তখন বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এদের স্বাবলম্বনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন—এমনকি কংগ্রেসী নেতারাও বাদ যান নি। বাসস্থানের সাথে সাথে নিজেদের জীবিকার্জ্জনের যতটুকু ব্যবস্থা এরা করে নিয়েছেন তাও নিজেদের প্রচেষ্টায়।

কিন্তু আজ এদের উচ্ছেদের প্রয়োজন হল কেন ? কেনই বা এই নূতন আইনের প্রয়োজন ? এর কারণ অত্যন্ত পরিস্কার। কলকাতার আশে পাশে যে সমস্ত জমিতে এই ক্যাম্প কলোনীগুলো গড়ে উঠেছে তার শতকরা নব্বুই ভাগ জমি হল বিড়লা, লায়েলকার ও বড় বড় জমিদারের। সুতরাং বাস্তুহারাদের উচ্ছেদ না করলে যে এই সমস্ত ধনকুবেরদের স্বার্থে ঘা পড়ে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। আর এই সমস্ত ধনকুবেরদের চির অনুগত পুঁজিপতি সরকার যে এদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রয়োজন হলে জনতাকে পিষে মেরে ফেলতেও কসুর করবে না এতে আর আশ্চয্য হবার কি ? সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই আইনের মূল উদ্দেশ্য কোটীপতিদের স্বার্থ রক্ষায় জনতাকে ধ্বংস করা। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ অনধিকারী উচ্ছেদের জন্য যে আইন প্রচালত ছিল সেই আইন এক্ষেত্রে বাস্তুহারাদের উচ্ছেদের ব্যাপারে খুব সাহায্য না করাতেই এই নূতন আইনের প্রয়োজন হল। সুতরাং এই আইনের উদ্দেশ্য যে উচ্ছেদ করা সেটা খুবই পরিস্কার এবং একথা বিলের মুখবন্ধে স্বীকার করা হয়েছে।

সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের যুক্তির সমর্থনে বলেছেন যে বাস্তুহারা নয় এ ধরণের অনেক লোক অবস্থার সুযোগ নিয়ে অন্যের জমিতে বসবাস করছে এবং তাদের [illegible] কিন্তু এটা একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা এই বিল প্রকৃত বাস্তুহারাদের ওপরেও যে প্রযোজ্য হবে সেটা বিলটিকে বিশদভাবে আলোচনা করলেই বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিরাপদে রক্ষা করা। সেই দায়িত্ব পালনেই সরকার এদের উচ্ছেদ করতে বাধ্য হচ্ছে। সেক্ষেত্রেও বক্তব্য যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিরাপদে রাখা যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব তেমনি এই সমস্ত বাস্তুহারাদের খাওয়া পরা, বাসস্থান ও উপজীবিকার পথ ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। সুতরাং একটি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অপর একটিকে কুঠারাঘাত করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। বিশেষ করে বাস্তুহারারা যখন নিজেরা এবং তাদের নিজস্ব সংগঠন সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের মারফৎ দাবী জানিয়ে এসেছে এই সমস্ত কলোনীগুলিকে আইনতঃ স্বীকার করে নেবার জন্য তখন এসব প্রশ্ন আসতেই পারে না। বাস্তুহারা দরদী (?) সরকার তাদের উচ্ছেদ করে নিজেদের শোষণমূলক রূপকে খুলে ধরতে সাহায্য করেছেন সন্দেহ নেই।

এবার বিলটি যেভাবে গৃহীত হয়েছে সেটা আলোচনা করা যাক্। বিলটিতে যে সমস্ত সংশোধন করা হয়েছে তাতে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সমূহ এবং বিশেষ করে "প্রতিরোধ কমিটির" নেতৃবর্গ এটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে এর ভেতর দিয়ে বাস্তুহারাদের অনেক লাভ হল, আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার বিলটিকে আমূল পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছে। একটু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে বিলটির মৌলিক কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি কয়েকটি সামান্য পরিবর্তন ছাড়া। প্রথমেই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বিলটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objective) কিছুই পরিবর্ত্তন হয়নি। সুতরাং প্রয়োজনমত এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই উচ্ছেদের কাজকে পাকাপোক্তভাবে চালান যাবে কারণ এখানে উচ্ছেদের কথা পরিস্কারভাবেই ঘোষনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ঘোষ ব্যানার্জ্জি সম্প্রদায়ের প্রস্তাব অনুজায়ী বিলের নাম অধিকারী উচ্ছেদ বিলের (Eviction of Persons in unauthorised occupation of land Bill) পরিবর্ত্তে উধাস্তু পুনর্বাসন ও অননুমোদিত জমি দখলকারীর উচ্ছেদ বিল (Rehabilitation of displaced persons and Eviction of persons in unauthorised occupation of land Bill) রাখা হয়েছে। যেখানে মূল বিলে উচ্ছেদের ব্যবস্থাকে একটুও পরিবর্ত্তণ করা হয়নি সেখানে নামের পরিবর্ত্তন জনতাকে ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু মাত্র নামের পরিবর্ত্তন Sugar Coated Quinine Pill এরই নামান্তর। সুতরাং নামের এই পরিবর্ত্তনকে যারা মৌলিক পরিবর্ত্তন বলে মনে করেছেন তাদের বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিলটির প্রত্যাখ্যানের জন্য বাস্তুহারাদের যে দাবী ছিল সেটা কার্য্যতঃ উপেক্ষিতই হয়েছে। শুধু তাই নয়, উচ্ছেদ এবং পুনর্বাসন একই সঙ্গে চলেনা বিলের নামে এইদুটি পরস্পর বিরোধী কথা বসাবার একমাত্র উদ্দেশ্য জনতাকে ধাপ্পা দেওয়া।

আগে বিলের যে নাম ছিল তাতে করে উদ্বাস্তু ভাইবোনেদের বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হত না বিলের মুল লক্ষ্য উচ্ছেদ। সংশোধিত বিলে বিলের উচ্ছেদকারী চরিত্রটি গোপন রাখা হয়েছে ধাপ্পা এবং পেছন থেকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে। বিধান সরকার যে শত্রুতা সামনাসামনি করতে চেয়েছিলেন ঘোষ-ব্যানার্জি নেতৃত্ব সেই আঘাতই করলেন প্রচ্ছন্নভাবে। এককথায়, ঘোষ-ব্যানার্জিরা হলেন ছদ্মবেশী বিধান রায়—গোপন শত্রু সেই হিসাবে অধিকতর মারাত্মক।

বিলটির দ্বিতীয় ধারায় আছে বাস্তুহারা সংজ্ঞা। সংশোধিত আকারে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যাক্তি বা যাহার পরিবার 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের' মতে সাধারনতঃ বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন কিন্তু ১৯৪৬ সালের অক্টবরের পরে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন" তাকেই উদ্বাস্তু বলে অবিহিত করা হবে। কিন্তু এর পরে যারা একই কারনে চলে এসেছেন বা আসতে পারেন তাদেরও এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত করা উচিত ছিল নতুবা তাদের জন্য আবার নূতন আইনের প্রয়োজন হবে। শুধু তাই নয়, যাদের পরিবার পূর্ব্ববঙ্গ হতে চলে এসেছেন তাদের বাস্তুহারা বলে গন্য করা হলেও তাদের নিজেদের বাস্তুহারা বলা হয়নি ! এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তো নেই বরঞ্চ এটা একটা ঘৃন্য চক্রান্তও বটে।

তাছাড়া বলা হয়েছে "প্রকৃত বাস্তুহারা"

★ বাস্তুহারা আন্দোলনে ঘোষ-ব্যানার্জী সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতা ★

তারাই যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য……। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়েও—এবং সে ভয়ের যথেষ্ট সত্যতা পাকিস্তানের অবস্থাই প্রমাণ করে—বহু লোক দেশ বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে। মূল বিলে "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তাহার ভয়ে" এই কথাটি বিলে,—সংশোধিত গৃহীত বিলে "এবং তাহার ভয়ে"……কথাগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। এইদিক থেকে বিলটিকে বাস্তুহারা সংজ্ঞা নির্দেশ করার ব্যাপারে বদ্‌ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা আছে। উপরন্তু উদ্বাস্তুদের মধ্যে "প্রকৃত" ও "অপ্রকৃত" ভাগ করার মূল লক্ষ্য উদ্বাস্তু ঐক্যকে ভাঙ্গন ধরানো। যারাই চোদ্দপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে চলে এসেছে তারাই প্রকৃত উদ্বাস্তু। অপ্রকৃত তারা কংগ্রেসী নেতাদের কাছে হতে পারেন কিন্তু আমাদের কেউই অপ্রকৃত নয়।

তৃতীয় ধারায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা, এবং কি উপায়ে, কতদিনের নটীশে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনধিকারী দখলকারীকে উচ্ছেদ করতে পারবে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সরকারী কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের সাথে আলোচনা করেই এই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত করবে। সরকারী লোকের অধিকাংশ যে এর সদস্য হবেন সেটা বিনা বাধায় বলা যেতে পারে। সুতরাং "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" যে বিড়লা লাহেলকার স্বার্থ দেখাই উপযুক্ত বলে মনে করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? দ্বিতীয়তঃ নিয়মতান্ত্রিক মতে সরকারী নিয়োগে হাইকোর্ট কোনদিনই হস্তক্ষেপ করেনি। যদি বলা হত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হাইকোর্ট নিযুক্ত করবে তাহলে তবু কথা ছিল। যেভাবে ধারাটি গৃহীত হয়েছে তার স্থূল মর্ম হচ্ছে সরকারের লোকেরাই "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের" সদস্য হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট—আইনজ্ঞ প্রভৃতি কথা বলার কোন মানে হয় না যেহেতু তাদের উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রকৃত দরদের কোন প্রমানই নেই। বিড়লা লাহেলকার লোক আইনজ্ঞ হতে পারেন এবং সরকারী মতে তারা নিযুক্তও হতে পারেন এবং তা হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ক্ষেত্রে বাস্তুহারাদের ভাগ্যে যে কি আছে তা বুঝতে কারোও কষ্ট হয় না।

বিলটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে চতুর্থ ধারা। এখানে বলা হয়েছে যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনধিকারী দখলকারীকে জমির মালিকের আবেদনের পর উপযুক্ত প্রমান নিয়ে উচ্ছেদ করতে পারবে। অবশ্য উল্লেখ আছে যে এই সমস্ত বাস্তুহারারা যাতে বিনা অসুবিধাতে তাদের উপজীবিকা চালাতে পারে এই ধরণের নিকটবর্তী স্থানে তাদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করেই উচ্ছেদ করা হবে। কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার যে এই নিকটবর্ত্তী স্থান নির্দ্ধারন করা হবে জমির দামের ওপর ভিত্তি করে। যে সমস্ত জমির দাম প্রতি কাঠা ১৫০্ টাকার বেশী হবে সেই সমস্ত জমি থেকেই উচ্ছেদ করা হবে। সুতরাং নিকটবর্ত্তী স্থানে পূনর্বাসন নির্ভর করবে এই দামের উপর। আর ফলে "নিকটবর্ত্তী" স্থান যে কোথায় দাড়াবে তার কোন ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া এই নতুন বসবাসের ব্যবস্থা আদপেই বাসোপযোগী হবে কি না সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। জমির মালিক ইচ্ছে করলেই এতদিনের বসবাসের জন্য ক্ষতিপূরন দাবী করতে পারে। এই বিলের এই দাবীকে রক্ষা করারই ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিষম দুর্যোগে বাস্তুহারাদের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করা কাটা ঘায়ে নুনের মত। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে জমির দামের ওপর লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় যে কলকাতার আশে পাশে যেখানে বেশীর ভাগ বাস্তুহারার সমাবেশ সেখান থেকেই উচ্ছেদ হবে বেশী। তাদের স্থান হবে এমন স্থানে যেখানে জমি বাসোপযোগীই নয়। দামের কথা চিন্তা করলেই একথা বোঝা যায়। নিকটবর্ত্তী কথাটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই হল বিলটির মোটামুটি রূপ। এথেকে কোথায়ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সদিচ্ছা প্রকাশ পায় না।

ভোটের জোরে বিল পাশ হলেও এর বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে আন্দোলন চলে আসছিল। এই বিলের বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই যে আন্দোলন হয়েছে সেটা হচ্ছে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের নেতৃত্বে। বিভিন্ন ক্যাম্প ও কলোনীতে এর বিরুদ্ধে প্রচার করা, সভা করা শুরু হয়েছিল বহুদিন থেকেই। এই সমস্ত প্রতিবাদের সংহত জন সমাবেশে রূপ দেওয়া হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারীর ময়দানের সভায়। সেখানে লক্ষাধিক বাস্তুহারা এই সরকারী নগ্ন শোষনের বিরুদ্ধে দাবী জানায় স্থায়ী পুনর্বসতি ও কলোনী স্বীকারের। এই আন্দোলন যখন ক্রমে ক্রমে তীব্র হতে তীব্রতর রূপ ধারণ করতে শুরু করল তখন দেখা গেল হঠাৎ একদিন কেন্দ্রীয় পরিষদকে না জানিয়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হল— যদিও এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পরিষদেরই ছিল। এই কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্দেশ্য যে সংঘবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরানো সেটাও ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার হল যখন দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় পরিষদ তাদের কাছে বার বার প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তারা বিলকে উচ্ছেদের জন্য প্রতিরোধ আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হতে চাইলেন না। এই প্রসঙ্গে কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা পরবর্ত্তী "উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির" আন্দোলনকে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমেই ব'লব এদের নেতৃত্ব সম্পর্কে। যে প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রী থাকাকালীন কুখ্যাত কালা কানুন (Security Act) পাশ করেছেন, যিনি সেই সময় ছাত্রদের ওপর অবাধে গুলি বর্ষণ করেছেন সেই প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ ব্যানার্জি প্রভৃতি হঠাৎ বাস্তুহারাদের প্রতি দরদী হলেন কেন সেটা বোঝা দরকার। ক্ষমতার দ্বন্দে আজ তারা পরাজিত—বিধান রায় প্রমুখ গদীতে আসীন। সেই ক্ষমতার দ্বন্দে লাভের আশা তখনই যখন তার পেছনে থাকে জন সমর্থন। বিশেষ করে নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত্তে জনহিতকর কাজের পরিচয় দিলে যে জয়ের পথ সুগম হয় ডাঃ ঘোষ সেটা ভাল করেই বোঝেন। তাই আজকে তারা বিরোধী প্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছেন। শুধু তাই নয়—বাস্তুহারা আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করাও এর একটা উদ্দেশ্য। 'উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির' সকলের সাথে না হলেও ডাঃ ঘোষ এবং ব্যানার্জির সাথে যে সরকারের একটা বোঝাপড়া আগের থেকেই হয়েছিল সেটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আর সকলে এদের দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে। এই বোঝাপড়ার প্রমাণ মেলে তখনই যখন দেখা যায় একদিন হঠাৎ উগ্ররূপ ধারণ করে নগণ্য সংখ্যক বাস্তুহারার সমর্থন নিয়ে এরা ১৪৪ ধারা অমান্য করে জনতাকে চমক লাগিয়ে দেয় আবার তার পর মুহূর্ত্তে বিলের কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হলে মূল উচ্ছেদের প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও যখন এরা জয়ধ্বনি ঘোষণা করে—আপোষের দিকে পা বাড়ায়। প্রথম আন্দোলন পরবর্ত্তী আপোষের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়; জনতার শক্তিতে ফাটল ধরিয়ে আপোষকে পুনর্বহাল করার প্রচেষ্টা মাত্র। সরকার এবং সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের সঠিক আন্দোলনে ফাটল ধরাবার প্রচেষ্টাকে দূর হতে অভিনন্দনই জানিয়েছে। বাস্তুহারাদের প্রতি আমাদের একান্ত আবেদন যে তারা যেন এই সমস্ত আপোষকামী তথাকথিত বাস্তুহারাদরদীদের চিনতে পারেন—তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। এই ধরণের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে সত্যিকারের আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের আন্দোলনকে কিছুটা আত্মসমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা প্রয়োজন। এর ভেতর কেউ কেউ মনে করেন যে সোজাসুজি আন্দোলনে কোন ফল হবে না একে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। প্রত্যক্ষ আন্দোলন নাকি উগ্রবামপন্থী নীতির পরিচায়ক। যখন জনসমর্থন না নিয়ে মুষ্টিমেয় লোক সরকারকে উচ্ছেদের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তখন সেটা উগ্রবামপন্থী নীতি সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন হাজার হাজার লোক সমবেত হচ্ছে, গণ সমর্থন ধ্বনিত হচ্ছে প্রচুর তখন সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবী অধিকারের আন্দোলন উগ্রনীতিতো নয়ই বরঞ্চ আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার সহায়ক। এইদিক থেকে দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতার অভাবই 'উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'কে সুযোগ দিয়েছে নগণ্য সহানুভূতি নিয়েও জনসাধারণের সামনে যাওয়াতে। বাস্তুহারাদের নিকট এরা খ্যাতি অর্জ্জন না করলেও ওপরে ওপরে কিছুটা যে খ্যাতি তারা কিছুক্ষণের জন্যও অর্জ্জন করেছিল তার কোন সুযোগই তারা পেত না কেন্দ্রীয় পরিষদের বিরাট সাংগঠনিক শক্তি ও সঠিক নেতৃত্বের কাছে। কিন্তু এই বিন্দুমাত্র ত্রুটি নিয়েও বাস্তুহারা পরিষদ যে মোটামুটিভাবে বাস্তুহারাদের সঠিক পথ—আন্দোলনের পথে—নির্দেশ দিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে বিলটি যেভাবে পাশ হয়েছে এতে তার মৌলিক পরিবর্ত্তন কিছু হয়নি—"উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি" যত জোর গলাতেই প্রচার করুক না কেন, বিলের বিস্তৃত আলোচনা সেই সাক্ষ্যই দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এর ভেতর দিয়ে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেটাকে সামনে রেখেই ঠিক হবে আশুকার্য্যক্রম। প্রথমকার আন্দোলনের রূপ বদলে যাবে সাধারণ আন্দো-

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

★ গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রাণকেন্দ্র শান্তি সমাবেশে

সঙ্গে তোমাদের সংগ্রামী সম্পর্ক স্থাপন কর।

ঘর ভাঙ্গা নয়—বাস্তুহারাদের ● ঘর বাঁধো ●

পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিভক্ত ভারতে বাস্তুহারা সমস্যা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। পথে প্রান্তরে বাস্তুহারারা নিজেদের প্রচেষ্টায় যে বাসস্থান তৈরী করেছে, তা থেকেও তাদের উচ্ছেদ করবার জন্য কংগ্রেসী সরকার আইন প্রয়োগ করতে চলেছে। আজও যদি বাস্তুহারার আন্দোলন সঠিক কর্ম্মপন্থায় গড়ে তোলা না যায় তবে এক বিরাট ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেবে। পুঁজিপতিদের সৃষ্ট বাস্তুহারা সমস্যাকে একটি বিশেষ সমস্যা ধরে অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে বাস্তুহারা আন্দোলনের বিচ্যুতি জটিলাকারে দেখা দেবে। তার জন্য প্রয়োজন পুঁজিপতি সরকার বিরুদ্ধ প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রত্যেকটি বাস্তুহারা অঞ্চলে সংঘবদ্ধ আন্দোলন কেন্দ্রীয়ভাবে গড়ে তোলা এবং আদর্শগত সংগ্রাম মারফৎ পুঁজিপতি সরকারের বিভিন্ন অপকৌশল সম্বন্ধে বাস্তুহারাদের ওয়াকিবহাল করান। বিশেষ করে বাস্তুহারাদের স্বার্থ যাতে কংগ্রেসী সরকার, কংগ্রেস বহির্ভূত সুবিধাবাদী নেতাদের খেয়াল খুসীর বস্তু না হয় তার জন্য সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী ধাপ্পা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন শক্তিশালী করতে হবে।

বাস্তুহারা ভাই বোনেরা! কংগ্রেসী সরকারের মধুর ভাষণ ও জোরাল প্রতিশ্রুতি আজ তোমাদের সমস্যা জটিল করে তুলেছে। ভোটযুদ্ধে জেতার জন্য তোমাদের নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা চোখের জলে নূতন গঙ্গা সৃষ্টি করছেন। শুধু কথায় পুনর্বসতির সমস্যা মিটিবে না—তাই পুনর্বসতি শিক্ষা ও জীবিকার দাবীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কর।

জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে —সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ● সাথে যুক্ত কর ●

গরীব জনসাধারণ! তোমার রুটী রুজি নিয়ে সরকার ছিনিমিনি খেলছে তোমার [illegible] চিত করে চলেছে। যতদিন ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকে থাকবে ততদিন তোমাদের সমস্যার মূল সমাধান অসম্ভব—কেবল মাত্র বাগাড়ম্বর ও প্রতিশ্রুতির মিষ্ট কথায় বারংবার ভোলাবার চেষ্টা চলবে। তোমাদের সমস্ত দাবী প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, খেয়ে পরে সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা চালাতে গেলে—যেখানেই থাক, রুটি রুজী ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোল। প্রগতিশীল আন্দোলনের অগ্রণী সর্বহারা মজুর শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন কর।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে প্রশস্ত ও শক্তিশালী কর

প্রগতিশীল সংস্কৃতির অনুশীলন আমরা করি সামাজিক মনের সুষ্ঠু ও সুন্দর রূপ বিকাশের সাহায্য করতে। জীবন সংগ্রামের সামগ্রিক অভিব্যক্তি হল সংস্কৃতি। সমাজ জীবন সংকটময় থাকলে সংস্কৃতির সংকট অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়। তাই সামাজিক মানুষের প্রগতির জন্য প্রগতিশীল সংস্কৃতি অনুশীলন অপরিহার্য। বিপ্লব বৃহত্তর মানুষের সুখী জীবন প্রতিষ্ঠা করে, আর সংস্কৃতি সুখী জীবনের সৌন্দর্য্য ও রূপ সম্বন্ধে মানুষের মূল্যবোধ জাগায়। কাজেই আজকে সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিপ্লবী আদর্শে আন্দোলন করার কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল সংস্কৃতির অনুশীলন মারফৎ বর্তমান সংস্কৃতির ভাববাদী অবাস্তবতা জনসাধারণকে বুঝিয়ে মহত্তর বাস্তব জীবনের প্রগতিশীল সংস্কৃতির চিন্তাধারায় জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা একান্ত জরুরী প্রয়োজন বলে পরিগণিত হওয়া উচিত। আমাদের দেশে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন বৃহত্তর সমাজে সাড়া জাগাতে পারে নাই —এমন কি দেশের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও আজ পর্য্যন্ত গড়ে উঠতে পারে নাই। তাই আজকের আশু প্রয়োজন বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য এই চিন্তায় পুষ্ট বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিবাদীদের সম্মিলিত করে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। প্রগ্রেসিভ ক্যালচারাল এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এরই বিকাশের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবি ও [illegible] সাহায্য দিয়ে প্রগ্রেসিভ ক্যালচারাল এসোসিয়েশনকে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে তুলতেই হবে।

গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট শক্তিশালী কর ● গণমোর্চা গড়ে তোল ●

বামপন্থী শক্তির নিকট আমাদের আবেদন, সক্রিয় সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যেকেই দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টির উর্দ্ধে সমাজ বিজ্ঞানের সঠিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সঠিক দল তথা সঠিক সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রসর হোন।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত কর্মসূচিতে বিভিন্ন ফ্রণ্টের গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্র অনেক প্রসার লাভ করেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সার্থক আন্দোলনের রূপ আজও গড়ে উঠে নাই একথা সকলেই স্বীকার করবেন। তাই আশু প্রয়োজন হিসাবে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টগুলির আন্দোলনের শক্তি আরও কিভাবে বাড়তে পারে এ প্রশ্ন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে আসা স্বাভাবিক।

সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠা এই সব গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টগুলির কেন্দ্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বে গড়ে উঠলেও একথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নাই যে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন দলের কর্ম্মীদের মধ্যে সৌহার্দ ও পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব আজও প্রকাশ পাচ্ছে না। আঞ্চলিক ও ছাড়াছাড়িভাবে এই সব গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টগুলির আন্দোলন বিভিন্ন দল বহুদিন যাবৎ করার ফলে কর্মীদের মধ্যে স্বার্থ প্রাচীর গড়ে উঠেছে তার বিষময় ফল স্বরূপ দেখতে পাই, আজও আমাদের দেশে বলিষ্ঠ একটি কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের অভাব। তাই সার্থক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব হিসাবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের উচিত নিজ নিজ দলের নীতি পরিবর্ত্তন করে এই ত্রুটি যথা সম্ভব দূর করতে সচেষ্ট হওয়া। আজকে বিভিন্ন আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় একথা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের আন্দোলন সার্থকভাবে গড়ে তোলার পক্ষে বিভিন্ন দলের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতার মনোভাব ও গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের নীতির সম্যক উপলব্ধি অত্যন্ত [illegible] রাজনৈতিক দলের নিকট আমাদের আবেদন, তারা যেন গভীরভাবে পূর্ণ সহযোগিতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সার্থক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন।

সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধোন্মাদনা থেকে সভ্যতাকে বাঁচাও

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা দুনিয়া দুই বিরুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে—আর এই দুই শিবিরের সংঘাত আজ তীব্ররূপ নিয়ে তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের ভূমিকা রচনা করতে চলেছে। পুঁজিপতি রাষ্ট্রগুলির নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধোন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে সামরিক শক্তি—উপর্য্যোপরি বৃদ্ধি করে চলেছে ও নানা ফিকিরে যুদ্ধ লিপ্সা মেটাবার চেষ্টা করছে। জনতা যুদ্ধ চায় না—তারা শান্তি চায়। কারণ বিগত মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের বুঝিয়েছে যুদ্ধের ধ্বংস স্তূপ নিপীড়িত জনতার প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠে; আর সে ধ্বংশস্তূপ থেকে সম্পদ লুটে নিজেদের মুনাফা পর্ব্বত প্রমান বাড়ীয়ে চলে পুঁজিপাতিরা।

শান্তির সংগ্রামে দায়িত্ব ● বুঝে নাও ●

তাই নিপীড়িত জনসাধারণ নিজ নিজ দেশে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে খতম করবার জন্য আস্থাভাজন শান্তির অগ্রদূত সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে সারা দুনিয়ার শান্তি আন্দোলনের ভিত পোক্ত করে চলেছে। আজ বিভিন্ন দল মত ও বিশ্বাস নিয়ে প্রত্যেক শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ভারতবাসীর দায়িত্ব হচ্ছে সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতের বুকে যুদ্ধ প্ররোচকদের চক্রান্ত বানচাল করা ও আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখতে কার্য্যকরী শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা। আজকে আমাদের সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা নিয়ে বিচার করবার দিন এসেছে, শান্তি আন্দোলনক সার্থকরূপ দিতে গেলে আন্দোলনের প্রকৃতি কি হবে। কারণ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে শান্তি আন্দোলনের নামে এমন এক ধরণের আন্দোলন সুরু হয়েছে যাতে জনতার ভিতর শান্তি আন্দোলনের স্বরূপ জাগানো তো দূরের কথা এদের কার্য্যক্রম পরোক্ষে দেশের অধিকাংশ শান্তি প্রিয় জনতা মজুর কৃষক গরীব জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন রেখে শান্তি আন্দোলনকে দলীয় সংগঠনে পরিনত করেছে। [illegible] যুদ্ধের ধ্বংশের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে নাই, সেখানে যদি শান্তি আন্দোলনের কার্য্যক্রম, কেবলমাত্র সই সংগ্রহের নীতিতে পর্য্য

সাধারণ মানুষের কর্তব্য নিয়ে এগিয়ে আসুন ★

বসিত হয়—শান্তি আন্দোলন নিপীড়িত জনতার বেঁচে থাকবার লড়াইয়ে কেন প্রয়োজন, কি সার্থকতা তার আছে—একথা যদি জনতাকে না বুঝান হয়, তবে আসলে দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে জনতাকে বিভ্রান্তিতে ফেলা হবে। শান্তি আন্দোলনকে ব্যাপকতর করবার জন্য দেশের বিভিন্ন দল মত নির্বিশেষে প্রত্যেক শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে সম্মিলিত ফ্রন্টে একাধারে যেমন জমায়েৎ করা দরকার, তেমনী ভুলে গেলে চলবেনা, এই সম্মিলিত ফ্রন্টের প্রধান অংশ গ্রহণ করবে—রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি—ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই পূর্ণ সহযোগীতায় এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশে শান্তি আন্দোলনে বিশেষ একটা দলের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টগুলিতে ব্যক্তির প্রাধান্য অধিক পরিমাণে দেওয়ার ফলে, শান্তি আন্দোলন ছোট গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে আছে, বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে নাই। ভারতের শান্তি কংগ্রেস শান্তি আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে পণ্ডিত নেহেরুকে আখ্যা দিয়ে যে বিশ্লেষণ ভঙ্গী প্রকাশ করেছে তাতেও মারাত্মক বিচ্যুতির নির্দেশ দেখা যায়। কোন দেশের বৈদেশিক নীতি যে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বহিঃপ্রকাশ—এ সত্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় ভারতবর্ষে যখন ধনতন্ত্রী রাষ্ট্র কাঠামো আছে, তখন তার বৈদেশিক নীতি কখনও নীতিগতভাবে ধনতন্ত্রী শিবীরের আওতার বাহিরে যেতে পারেনা। অথচ এই নেহরুর শ্রেণী চরিত্রকে উপেক্ষা করে, পূর্বাপর বৈদেশিক নীতি অনুশীলন না করে—"শান্তি কংগ্রেস" নেহরুকে শান্তির অগ্রদূত আখ্যা দিয়ে শান্তি আন্দোলন ক্ষেত্রে চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। ভারতে বর্ত্তমান অবস্থায় যেখানে অধিকাংশ জনতার সম্মিলিত আন্দোলন এই নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে, তাকে অবজ্ঞা করে শান্তি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য শান্তিপ্রিয় বৃহত্তর জন সমষ্টির সহযোগিতায় শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলে যুদ্ধবাজদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার সদ্ ইচ্ছা কখনও সম্ভব হতে পারে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ যদি লাগে, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার চাপে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্র সঙ্কোচিত হয়ে যাওয়ার ফলে সমস্ত আন্দোলন নিস্ক্রিয় হতে বাধ্য হবে।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষই শান্তি আন্দোলন থেকে বাইরে নয়

তাই আজকে শোষিত নিপীড়িত বিভিন্ন মত, পথ ও বিশ্বাস নিয়ে প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসীকে আমরা সক্রিয় শান্তি আন্দোলন জোরদার করতে আহ্বান করছি। তৃতীয় মহাযুদ্ধের যে কাল মেঘ ঘনিয়ে আসছে তার প্রতিক্রিয়া প্রত্যেক দেশের জনসাধারণকেই বিপর্য্যস্ত করবে—এই দ্বন্দ্বের বাইরে তৃতীয় শক্তির অবস্থান অসম্ভব। যারা বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের নাম করে শান্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিস্ক্রিয়তার পরিচয় দিচ্ছে তারা জনতার চরম মুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। জনশক্তিকে সংঘবদ্ধ করে যুদ্ধকে রোখার পরিকল্পনা যেমন আমরা নেব, অন্যদিকে পুঁজিপতি শ্রেণী পোষা দালালদের দ্বারা যুদ্ধ চক্রান্ত কার্য্যকরী করতে চাইলে সংঘবদ্ধ জনশক্তি দিয়েই যুদ্ধবাজদের খতম আমরা করবো। যুদ্ধের জন্য প্রচার যারা করে,—যুদ্ধের অনুকূলে দেশের সংস্কৃতিকে যারা বিকৃত করে—তাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম আমরা নিয়ত চালিয়ে যাব, প্রগতিশীল সংস্কৃতির ব্যাপক আন্দোলন মারফৎ বিকৃত সংস্কৃতির আমরা লোপ করব।

অনধিকার উচ্ছেদ বিল রোধ কর

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

লনের স্থান নেবে প্রতিটি ক্যাম্প কলোনীতে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন। দ্বিতীয়তঃ বিলটি প্রতিটি ধারা উপধারা বাস্তুহারা ও জনতার সামনে বুঝিয়ে দিতে হবে, দেখাতে হবে যে কোন মৌলিক পরিবর্ত্তনই হয়নি এর ভেতর। এই ধরণের ব্যাখ্যামূলক আন্দোলন (Explanatory campaign) এর ওপর অনেকখানি নির্ভর করবে সক্রিয় আন্দোলনের শক্তি। এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির অধিনস্থ বাস্তুহারাদেরও সক্রিয় আন্দোলনে টেনে আনতে হবে। সুতরাং বিলটি পরিষদে পাশ হলেও এর কার্য্যকারিতা নির্ভর করছে প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রতিরোধের ওপর। প্রত্যেক ক্যাম্প কলোনীর অধিবাসীদের নজর রাখতে হবে যে তারা যেন এমন তীব্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন যাতে এই আইন একটি কাগজী আইনে রূপান্তরিত হয়। তার জন্য প্রয়োজন বাস্তুহারা আন্দোলনকে প্রথমতঃ অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা দ্বিতীয়তঃ নিজেদের ভেতর সত্যিকারের সংগ্রামী একতা গড়ে তোলা। এই একতা গড়ে উঠবে তল থেকে আন্দোলনের মারফৎ। যারাই সংগ্রামের পক্ষপাতী, আপোষ রফার ভেতর দিয়ে বাস্তুহারা স্বার্থকে বিসর্জন দেবার বিরোধী—তাদের সাথেই এই একতা সম্ভব। তাই কৃষকপ্রজা মজদুর পার্টি প্রভৃতির নেতৃত্বের সাথে একতার কথা সত্যিকারের আন্দোলনের পরিপন্থি। এই আন্দোলনকে কার্য্যকরী করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ক্যাম্প এবং কলোনীতে অপরের সাহায্যের আশায় বসে না থেকে নিজেদের প্রচেষ্টায় ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়তে হবে। এই বাহিনী হবে আন্দোলনের শক্তি। এ ছাড়া এই আন্দোলনকে একটা সক্রিয় দেশ জোড়া আন্দোলনে রূপ দেবার ও গণতান্ত্রিক লোকের সহানুভূতি আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি স্থানে স্থানীয় কল কারখানা স্কুল কলেজ প্রভৃতির সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। প্রয়োজন মত প্রত্যেকটি কর্মক্ষেত্র থেকে ও বাস্তুহারা প্রতিনিধিদের নিয়ে "সংগ্রাম পরিষদ" (council of action) গঠন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে এটাই হচ্ছে আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। তার জন্য পিছিয়ে পড়লে চলবে না, মনে দৃঢ়তা ও পাথরের ন্যায় শক্ত একতা প্রতিষ্ঠার মারফৎ এই আইনকে অমান্য ও ধূলিসাৎ করতে হবে। বাস্তুহারাদের ভেতর কেহ যাতে পেছন দরজা দিয়ে সুযোগ সুবিধে গ্রহণ করে আন্দোলনে ফাটল ধরতে না পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এই ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করলেই আমরা উচ্ছেদ বিলের সমাধি রচনা করতে ও ভবিষ্যতের পথ সুগম করতে সক্ষম হব। এটাই হবে আজকের দিনে একমাত্র মুখ্য কার্য্যক্রম।

সিংভূম জেলা কিষাণ সম্মেলন

★ প্রস্তুতির কাজে কিষানদের বিপুল সাড়া ★

সিংভূম জিলার কিষাণ সম্মেলনের প্রস্তুতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বিশিষ্ট কিষাণ নেতা সহ পঞ্চাশ জন সদস্য লইয়া যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার উদ্যোগে পূর্ণোদ্যমে কাজ অগ্রসর হইতেছে। অভ্যর্থনা সমিতির এক সভায় একটি কার্য্যকরী সমিতি নিযুক্ত হইয়াছে। বিহার প্রদেশের বিশিষ্ট কিষাণ নেতা কমরেড হীরেন সরকার কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক এবং কমরেড কৃষ্ণা চৌবে প্রচার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রতিনিধিদের কি একটাকা করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। কর্মীদের সিংভূম জিলার সংযুক্ত কিষাণ সভার ঘাটশীলাস্থ আফিসে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সম্মেলন ২১শে এপ্রিলের পরিবর্ত্তে আগামী মে মাসের ১২ই ও ১৩ই হইবে। সম্মেলণ উদ্বোধন করিবেন বিহার প্রাদেশিক সংযুক্ত কিষাণ সভার সম্পাদক কমরেড যদু নন্দন শর্মা। সভাপতিত্ব করিবেন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জি। সম্মেলনে কমরেড শিবদাস ঘোষ, পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী, কমরেড প্রীতিশ চন্দ বিশ্বনাথ দুবে, সুধীন প্রামানিক প্রভৃতি বিশিষ্ট বামপন্থী নেতৃবৃন্দ যোগদান করিবেন। সম্মেলনে একটি প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনীও হইবে।

ইউনাইটেড পিস ফ্রন্ট পার্কসার্কাস বেনেপুকুর শান্তি ★ সম্মেলন ★

২৮শে ও ২৯শে এপ্রিল

আগামী ২৮শে এবং ২৯শে এপ্রিল পার্কসার্কাস বেনেপুকুর শান্তি সম্মেলনের দিন স্থির হয়েছে। দলমত নির্ব্বিশেষে এই এলাকার বাসিন্দাগণ বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের আবেদনে স্বাক্ষর করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাধীনভাবে গড়ে তুলেছেন। সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে শ্রী জে, সি, গুপ্ত এবং ডাঃ জে, কে, ব্যানার্জী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পড়ুন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের ইংরাজী মুখপত্র

Socialist Unity

৭৮, ধর্মতলা ষ্টীট কলিকাতা—১৩

"শান্তি আজ ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা"

খড়দহের সংস্কৃতিক সম্মেলনের অভিমত

(সংবাদাতা)

পৃথিবীতে আর এক বিশ্ব যুদ্ধের অবতারণা করিবার জন্য ইংমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী ও তার দালালদের যেমন প্রচেষ্টার অন্ত নাই, জনসাধারণেরও তেমনি সেই ভয়াবহ যুদ্ধ প্রতিরোধ করার সংকল্পের দৃঢ়তার অভাব নাই। তাই ৮ই এপ্রিল রবিবার খড়দহ পাঠচক্রের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে "শান্তি ও প্রগতির" উপর যে বিতর্ক সভা হয়, বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের মহান প্রচেষ্টার অংশ হিসাবেই ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন "নেশন" পত্রিকার সম্পাদক, মোহিত কুমার মৈত্র মহাশয় ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুর মহকুমার ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা সুরেশচন্দ্র চ্যাটার্জী। পাঠচক্রের বিবরণী পাঠের পর ইহার পাঁচজন সদস্য বর্তমান সময়োচিত পাঁচটী বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন। বিতর্কে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে স্থানীয় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নেতা সনৎ দত্তের বক্তব্যটী সবচেয়ে প্রণিধান যোগ্য হয়। তিনি প্রগতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন "প্রগতি গতিরই পরিণতি আর দ্বন্দ্ব ব্যতীত এই গতির অস্তিত্ব নাই। বিভিন্ন শক্তির যে অংশের পদচারণা সম্মুখের দিকে এবং যার মধ্যেই এই গতির পরিণতি সেই অংশের কথা যারা বলে তারাই প্রগতিশীল। তাই আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যুগে সমাজতন্ত্রই প্রগতিশীল মতবাদ।" তিনি আরও বলেন, "আজকের শান্তির আহ্বান শোষক ও শোষিতের মধ্যে শান্তির জন্য নয়, আজকের শান্তির আহ্বান ইঙ্গ মার্কিন যুদ্ধজোটের ঘৃণ্য যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিরোধের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। এই শান্তির লড়াইকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সাথে যোগ করে দিতে হবে।" ইহার পরে ইনষ্টিটিউট অফ আর্ট এণ্ড কালচারের তরফ হইতে শিল্পী তাপস দত্ত তাঁহার আবেগময়ী বক্তৃতায় যাঁহারা শান্তি আন্দোলন বলিয়া কিছুই নাই বলে তাঁহাদের সেই ধারণাকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেন এবং ইহা ভুল প্রমাণ করিয়া, ইহাকে শান্তি আন্দোলনকে ব্যহত করার ঘৃণ্য [illegible] করেন। [illegible] সভাপতি মোহিত মৈত্র মহাশয় শান্তি আন্দোলনে ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া বলেন যে শান্তিকে বাস্তবে আনয়ন করিতে হইলে তাহার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে, ইহার জন্য প্রয়োজন প্রথমতঃ যে সব দেশে বিদেশী দখলদার সৈন্য আজিও রহিয়াছে সেই সব দেশ হইতে তাহাদের অপসারণ, দ্বিতীয়তঃ খণ্ডিত জার্মানিকে সংযুক্ত করিতে হইবে, পশ্চিম জার্মানিকে পুনঃ অস্ত্র সজ্জিত করা চলিবে না। তৃতীয়তঃ জাপানের সহিত শান্তি চুক্তি করিতে হইবে। চতুর্থতঃ যুদ্ধ প্রচার বোধ করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ বিশ্বের বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। ইহার পর অনুষ্ঠানের কার্য্য শেষ হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন অবস্থায় মধ্যে মধ্যে লোক সংগীতে ও কবিতা আবৃত্তিতে বেশ সহজ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

খাদ্য-বস্ত্রের অভিযানে ভুখা জনতার দৃঢ় সংকল্প

● ময়দানে বিরাট জনসমাবেশ ●

গত ৩১শে মার্চ শনিবার বৈকাল ৪টায় কলিকাতা মনুমেণ্টের পাদদেশে কেন্দ্রীয় খাদ্য অভিযান কমিটির উদ্যোগে খাদ্য-বস্ত্রের দাবীতে এক বিরাট জনসভা ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

খাদ্য-বস্ত্রের অভিযানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী বলেন, দেশের বর্ত্তমান খাদ্য ও বস্ত্র সংকট যে শোচনীয় আকার ধারণ করেছে তা কোন মতেই স্বাভাবিক নয়। সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতি ও বণ্টন ব্যবস্থাই ইহার প্রমাণ দিবে। যাঁরা দেশে খাদ্য দ্রব্য ঘাটতি বলে চিৎকার করেন; তারা না খবর রাখেন প্রকৃত ফসল উৎপাদনের পরিমাণের, না জানেন চরম ঘাটতি এলকায় ও কিভাবে ঘাটতি পূরণ করতে হয়।

সর্বশেষে কমরেড মুখার্জী, জনতার খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের অভিযানে যে সমস্ত বামপন্থী দল ও প্রতিষ্ঠান এখনও ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারেননি তাদের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, সত্যিই যদি জনতার দল বলে দাবী রাখেন তবে জনতার খাদ্য বস্ত্রে বাসস্থানের এই দারুণ সংকটে ঐক্যবদ্ধ অভিযানে সামিল হউন;—আর যারা নানা অজুহাতে এই অভিযান ঘাটল ধরাবার অপকৌশল প্রয়োগ করছে, তাদের সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখুন—খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের অভিযান সার্থক হবেই।

কংগ্রেসী সরকারের আমলে জনসাধারণের শোচনীয় খাদ্য-বস্ত্রের অবস্থা বর্ণনা করে ডিমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ডের নেতা কমরেড জীবন লাল চট্টোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে খাদ্য-বস্ত্রের সংগ্রামকে জোরদার করার আহ্বান জানান।

খাদ্য সঙ্কট দূর করার পথ ব্যাখ্যা করে ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী বলেন যে, কংগ্রেসী সরকারের পরিবর্তে বামপন্থীরা যদি ক্ষমতায় থাকতো তবে সাতদিনের মধ্যে খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, এর জন্য ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বাণ জানান—ইহাই সাধারণের পথ প্রশস্ত করবে।

সভায় খাদ্য বস্ত্রের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় খাদ্য অভিযান কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রমোদ সেনগুপ্ত এবং তেলেঙ্গানার বীর কিষাণদের ফাঁসী রদের দাবী করে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন উইমেন্স কালচার্যাল এসোসিয়েশনের সম্পাদিকা কমরেড গায়ত্রী দাসগুপ্ত।—

কমরেড অনিল সেন, দেবনাথ দাস, জ্যোতিষ জোয়ার্দ্দার প্রমুখ বক্তাগণ খাদ্য বস্ত্রের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করে ও খাদ্য বস্ত্রের অভিযান জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে সভায় বক্তৃতা করেন।

সভাপতির অভিভাষণে ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ সেন, খাদ্য অভিযানের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহের কথা বর্ণনা ক'রে এই অভিযানকে ঐক্যবদ্ধভাবে চালিয়ে যেতে আহ্বান জানান।

এস, ইউ, সি, দিবসে—গ্রীষ্মকালীন রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় দপ্তর (১বি একজিবিশন রো, কলিঃ ১৭) হইতে কমরেড শচীন ব্যানার্জী জানাইতেছেন যে, এবার এস, ইউ, সি, দিবস উপলক্ষে অন্যান্য বারের মত সারা ভারত গ্রীষ্মকালীন রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির (Summer School of Politics) আগামী ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল ব্যারাকপুর অন্তর্গত খড়দহে অনুষ্ঠিত হইবে।

গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবিরে অংশ গ্রহণকারীদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি জরুরী প্রসঙ্গ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। প্রত্যেক ইউনিট, কেন্দ্র, জিলা, প্রদেশকে তাহাদের নিজ নিজ অংশগ্রহণকারীর নামের তালিকা আগামী ২৪শের মধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইতে হইবে।

২। সভ্য, সমর্থক, সহানুভূতিশীল মাত্রই ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যথাক্রমে তাদের কেন্দ্র, জিলা, প্রদেশিক সম্পাদকের অনুমোদন পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে।

৩। উক্ত দুই দিন অংশগ্রহণকারীদের বাধ্যতামূলকভাবে [illegible]শিবিরে অবস্থান করিতে হইবে—খাদ্যদ্রব্য প্রত্যেককেই সাথে আনিতে হইবে।

৪। খাওয়া খরচ বাবদ প্রতি দিনের জন্য এক টাকা হারে পূর্বাহ্নেই জমা দিতে হইবে।

এবারের গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবিরের নির্দ্ধারীত বিষয়-বস্তু নিম্নে দেওয়া গেল।

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা।
- কংগ্রেসী সরকারের খাদ্য, বস্ত্র, বাস্তহারা নীতি ও সাধারণ নির্বাচন।
- ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বশেষ নীতি ও কর্মপন্থা সমালোচনা।
- সোস্যালিষ্ট পার্টির সোস্যাল ডেমোক্রাটিক স্বরূপ উদঘাটন।
- ট্রটস্কীপন্থীদের পরষ্পর বিরোধী ও বিভ্রান্তিক মতবাদ বিশ্লেষণ।
- সুদূর প্রাচ্য ও এশিয়ার গণজাগরণের গতি প্রকৃতি।
- ইউরোপে সাম্যবাদী (ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি) অগ্রগতি।
- কোমিনফর্মের নেতৃত্ব।
- নয়া-গণতন্ত্র; চীন, পঃ ইউরোপিয় নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহ।
- নয়া গণতন্ত্র ও ভারতবর্ষ।
- সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও ভারতবর্ষ।
- আজকের দিনে সোভিয়েট সমাজব্যাবস্থা ছাড়াই সমাজতন্ত্রে পৌছান সম্ভব কি না?
- এস, ইউ, সি'র মতবাদিক অভিযান।
- এস, ইউ, সি'র সাংগঠনিক প্রসারের মূলনীতি ও কৌশল বিশ্লেষণ।
- গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।
- ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন।
- কিষাণ আন্দোলন।
- ছাত্র ও যুব আন্দোলন।
- সাংস্কৃতিক ও মহিলা আন্দোলন।
- বিশ্ব শান্তি আন্দোলন ও ভারতবর্ষ।
- ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনের রূপ বৈশিষ্ট ও গতি কোনপথে।

বিঃ দ্রঃ—নূতন কোন বিষয় বস্তু আলোচনায় উঠাইতে হইলে ২৪শে এপ্রিলের মধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

বিস্তারিত কার্য্যসূচী শিক্ষা শিবিরে জানানো হইবে।

প্রথম দিনের কাজ সকল ৮ ঘটিকায় সুরু হইবে।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।